ইউনিট ৬

উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থাপনা

[Management of Higher Education]

ভূমিকা

ব্যক্তি, সমাজ ও দেশের সামগ্রিক অগ্রগতির জন্য উচ্চশিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সমকালের চতুর্মুখী ও স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর উচ্চ শিক্ষা। এই উচ্চ শিক্ষার ভূমিকা সম্পর্কে কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের উল্লেখযোগ্য দিক নির্দেশনা এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

(ক) বিভিন্ন উচ্চতর কাজের জন্য সুনিপুন জ্ঞানদক্ষ ও দূর দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি তৈরি করা।

(খ) এমন শিক্ষিত জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করা যাঁদের কর্মানুরাগ, জ্ঞান স্পৃহা, চিন্তার স্বাধীনতা, ন্যায়বোধ ও মানবিক মূল্যবোধ সম্যক বিকশিত হয়েছে।

(গ) গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞানের নবদিগন্ত উন্মোচন করা এবং

(ঘ) সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলির বিশ্লেষণ ও সমাধানের পন্থা নির্দেশ করা।

এদেশের উচ্চ শিক্ষার সূচনা হয় ১৯২১ সালে ইংরেজ শাসনামলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। অতঃপর ভারত বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান এই দুইটি রাষ্ট্রের জন্ম হয় এবং ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের আবির্ভাব ঘটে। বর্তমান ইউনিটে সমগ্র উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থাপনা, ইংরেজ শাসনামল থেকে শুরু করে বাংলাদেশ পর্যন্ত বিষয়বস্তুকে তিনটি পাঠে উপস্থাপন করা হল:

পাঠ- ৬.১: প্রাচীন ভারত ও ইংরেজ শাসনামলে উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা

পাঠ- ৬.২: ১৯৪৭-১৯৭১ সময়ে এদেশের উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা

পাঠ- ৬.৩: বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ভূমিকা

পাঠ ৬.১ প্রাচীন ভারত ও ইংরেজ শাসনামলের উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- প্রাচীন ভারতের উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বলতে পারবেন;
- প্রাচীন ভারতে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য কোন কোন দেশের শিক্ষার্থী আসত এবং কি কি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- ভারত উপমহাদেশে উচ্চ শিক্ষা প্রসারে ইংরেজ শাসনামলে কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল তার বিবরণ দিতে পারবেন ;
- ইংরেজ শাসনামলে ভারতে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অনুসৃত শিক্ষাসূচি বর্ণনা করতে পারবেন;
- বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ব্যবহৃত শিক্ষাদান পদ্ধতির বিবরণ দিতে পারবেন এবং
- ইংরেজ শাসনামলে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রশাসন ব্যবস্থা কিরূপ ছিল তা উলে-খ করতে পারবেন।

প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাচীন ভারতে যে সব স্থানে উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয় তন্মধ্যে বিহার, গুজরাট, ঘট্টিকাশ ও বাংলা অন্যতম। উল্লিখিত স্থানের প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় হল:

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে নালন্দা, বিক্রমশীলা এবং ভল্লবী সবচেয়ে প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়। বিহারের নালন্দাতে বিভিন্ন বিষয় পড়ানো হত এবং নেপাল, চীন, তিব্বত, কোরিয়া এবং অন্যান্য দেশ থেকে ছাত্ররা পড়াশুনা করতে আসত। নালন্দার প্রতিযোগী বিশ্ববিদ্যালয় ছিল গুজরাটের ভল্লবী। বিভিন্ন ধর্ম এবং দর্শন মূলত শিক্ষা দেওয়া হত। তখন বিহারের ভাগলুরে বিক্রমশীলা বেশ নাম করে। পরবর্তীতে বাংলায় জগদধলা, মিথিলার আদানতপুরী, নদিয়ায় এবং দক্ষিণ ভারতে ঘট্টিকাশ উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ১৬শ শতাব্দিতে বেনারস উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।

ব্রিটিশ আমলে বিভিন্ন স্তরে শিক্ষা সম্বন্ধীয় কমিটি ও কমিশনের রিপোর্ট প্রণীত হয়েছিল। এর মধ্যে উলে-খযোগ্য হল: ইউনিভার্সিটি কমিশন (১৯০২) রিপোর্ট, কলিকাতা ইউনিভার্সিটি কমিশন (১৯১৭) রিপোর্ট, হেগ কমিটি অব ১৯২৯ রিপোর্ট, সাপ্রু কমিটি অব ১৯৩৪ রিপোর্ট, সার্জেন্ট রিপোর্ট (১৯৪৪), কিন্তু উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি হয়নি।

ইংরেজ আমলে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ইউরোপ অনেক সমৃদ্ধশালী হলেও ইংরেজ শাসনের প্রথম একশত বছর ভারতে উচ্চ শিক্ষার জন্য তেমন কিছু করা হয়নি। ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় পাঞ্জাব, ১৮৮৭ সালে এলাহাবাদ, ১৯১৬ সালে বেনারস ও মহীশূর, ১৯১৮ সালে হায়দ্রাবাদ, ১৯২০ সালে আলীগড়, ১৯২১ সালে ঢাকা ও লাক্ষ্ণো, ১৯২২ সালে দিল্লী, ১৯২৩ সালে নাগপুর ও অন্ধ্র, ১৯২৭ সালে আগ্রা, ১৯২৯ সালে আন্ডামাইল, ১৯৩০ সালে ত্রিভাঙ্কুর, ১৯৪৩ সালে উৎকল, ১৯৪৬ সালে সউগার ও ১৯৪৭ সালে রাজস্থান। ১৯৪৭ সালের মধ্যে মোট ১৯টি বিশ্ববিদ্যালয় ও ৪৯৭টি কলেজ (ছাত্র-ছাত্রী ২,৩৭,৪৫৬) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত হলেও সে মডেলে তৈরি

হয়নি। তার কারণ ভারতে অবস্থানগত পরিবেশ ভিন্ন ছিল। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভারতের বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভারতীয় ধাচে গড়ে উঠে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাসূচি

উচ্চ শিক্ষার সিলেবাসের একটি বড় অংশ জুড়ে ছিল ইংরেজি শাসনের ইতিহাস। এদেশের ইতিহাস ও দর্শন ছিল প্রায় উপেক্ষিত। বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার উপর কোন প্রকার গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। কেরাণী তৈরির জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় সাধারণ ও গতানুগতিক শিক্ষার উপর প্রাধান্য দেওয়া হত। প্রথম দিকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছিল পরীক্ষাসর্বস্ব। কারিকুলাম বা সিলেবাস তৈরিতে শিক্ষকদের ভূমিকা ছিল নাম মাত্র। পরীক্ষা পাশের জন্য যা যা শেখা দরকার তা পাঠদানই ছিল শিক্ষকদের প্রধান কাজ।

শিক্ষাদান পদ্ধতি

লেকচার পদ্ধতি ছিল শিক্ষাদানের প্রধান উপায়। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান চলত। প্রশ্ন করা বা আলোচনা করা হত না। বিষয়ভিত্তিক আলোচনা বা সেমিনার হত না। ছাত্রদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা জাগুক এটি কোনক্রমেই কাম্য ছিল না। ছাত্ররা/শিক্ষকেরা পরীক্ষার মাধ্যমে সততা যাচাই করবে এই সুযোগ ছিল না। তথ্য সংগ্রহ ও অধিক তথ্য জানার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হত। স্বাধীনভাবে সমস্যা চিহ্নিত করা, সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবন ও সৃজনী শক্তি বিকাশের উপর গুরুত্ব দেওয়া হত না। টিউটোরিয়াল সিস্টেম চালু হলেও ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতের জন্য কখনো সুফল বয়ে আনতে পারেনি।

প্রশাসন ব্যবস্থা

ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বায়ত্বশাসিত হলেও এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করত শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এদেশের বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্বশাসনকে শিক্ষার দিক থেকে বিবেচনাবর্জিত ও রাজনৈতিক দিক থেকে ভয়াবহ মনে করা হত।

পরীক্ষা পদ্ধতি

কোন মতে পরীক্ষা পাশ করা ছিল ছাত্রদের প্রধান উদ্দেশ্য। রচনা পদ্ধতির পরীক্ষা বৃটেন থেকে ধার করে নেওয়া হয়। প্রত্যেক পরীক্ষার উত্তর ইংরেজিতে লিখতে হত এবং এ বিদ্যায় পারদর্শিতা পরীক্ষা পাশের জন্য অপরিহার্য ছিল। ইংরেজিতে উত্তর দেওয়া গুটি কয়েক ছাত্র ছাড়া অধিকাংশ ছাত্রের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় নিম্নোক্ত দিকে শিক্ষার্থীদের মনোনিবেশ করতে হত:

(ক) উচ্চ শিক্ষায় পড়াশুনা নির্বাচিত অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

(খ) মুখস্ত করা এবং এর জন্য অনেক সময় নষ্ট করা।

(গ) লেকচার নোট এবং নোট বই এর উপর নির্ভর হওয়া।

(ঘ) প্রাইভেট পড়ার প্রবণতা।

(ঙ) মুখস্থ বিষয় মুখস্থ উপস্থাপন করার প্রবণতা।

অন্যান্য কর্মকাণ্ড

অনেক ত্রুটি, দুর্বলতা ও অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও আমাদের শিক্ষিত সমাজের বড় একটি অংশ এতে সন্তুষ্ট ছিলেন। তার কারণ কম খরচে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অনেককে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। সমাজের ক্ষুদ্র একটি অংশ এ ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাদের মতে শিক্ষা ব্যবস্থায় দেশাত্ববোধ ও দেশ চিন্তা অনুপস্থিত। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেন যে, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের সাথে সাধারণ মানুষের বিরাট ব্যবধান। তিনি চেয়েছিলেন এশীয় ও পশ্চিমা সংস্কৃতির

সুন্দর সংমিশ্রণ ও সংহতি। বিশ্বভারতীর মাধ্যমে তিনি এর রূপ দিতে চেয়েছিলেন। ১৯৪৭ পূর্ব শিক্ষাব্যবস্থা, উচ্চ শিক্ষাতো বটেই, শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে।

মহাত্মা গান্ধীও ব্রিটিশ ধারার উচ্চ শিক্ষার বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি বৃটিশ পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থাকে ভারতীয় চিন্তা ও চেতনায় অবাস্তব এবং ক্ষতিকর বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি এই ব্যবস্থাকে "Unmitigated Evil" বলতেন। তিনি ১৯২০-২২ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় অনেকগুলো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। চরিত্র গঠন, জাতীয় আন্দোলন পরিচালনা এবং ব্রিটিশ রাজ -এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করা এসব বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

নতুন ভাবধারায় স্থাপিত অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়

এন্নি বাসান্ত নুতন ধরনের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য রক্ষার জন্য পণ্ডিত মদন মোহন মালাভিয়ার সাথে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। নূতন ভাবধারায় ১৯১৭ সালে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯১৮ সালে পুনাতে ডি. কে কারভে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় যা পরে SNDT University নামে পরিচিতি লাভ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. প্রচীন ভারতে কোথায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল?

২. ভারতের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় কোন কোনটি?

৩. নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন কোন দেশের ছাত্ররা পড়ালেখা করত।

৪. ব্রিটিশ শাসনামলে কোন কোন কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল।

৫. ইংরেজ আমলে ভারতে কখন কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল?

৬. ইংরেজ শাসনামলে উচ্চ শিক্ষার পাঠ্যসূচি কিরূপ ছিল?

৭. ইংরেজ শাসনামলের পরীক্ষা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য কি কি?

পাঠ ৬.২

১৯৪৭-১৯৭১ সময়ে এদেশের উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর এদেশের উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থা উল্লেখ করতে পারবেন;
- ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন ও তৎপরবর্তী সময়ের উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা আলোচনা করতে পারবেন;
- পাকিস্তানের জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠনের (শরীফ কমিশন) পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন;
- শরীফ শিক্ষা কমিশনের (১৯৫৯) রিপোর্টে উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কিত সুপারিশসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন এবং
- ১৯৬১-১৯৬২ সালের উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কে ছাত্র আন্দোলনের কারণ ও তৎপরবর্তী উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা উল্লেখ করতে পারবেন।

১৯৪৭-৭১ সময়েয় উচ্চ শিক্ষা

দেশ বিভাগের পর এদেশের উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থা

১৯৪৭ সালের পর শিক্ষা ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন আশা করা হয়েছিল। কিন্তু সামগ্রিক প্রশাসন ও শিক্ষার সাথে যাঁরা জড়িত ছিলেন তাঁদের মনমানসিকতা পরিবর্তনের পক্ষে ছিল না। কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বল দিকগুলো আগের চেয়ে আরো স্পষ্টভাবে প্রকাশ হতে থাকে। ফলে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য সামাজিক চাপ সৃষ্টি হয়। চাপের ফলে সমগ্র পাকিস্তান শিক্ষা কনফারেন্স, এদেশের (পূর্ব পাকিস্তানের) শিক্ষা ব্যবস্থাকে সংস্কারের সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে সতের সদস্যবিশিষ্ট একটি শিক্ষা কমিটি ১৬ মার্চ, ১৯৪৯ সালে গঠন করে। এই কমিটির প্রধান ছিলেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিক মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খান। মাওলানা আকরাম খান -এর নেতৃত্বাধীন শিক্ষা কমিটি "পূর্ববঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন কমিটি"। ১৯৫২ সালে এই কমিটি তার রিপোর্ট সরকারের নিকট পেশ করে। অতঃপর তৎকালীন পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারকে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সংস্কারের জন্য পরামর্শ দানের জন্য তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকারের মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ জনাব আতাউর রহমান খানকে চেয়ারম্যান করে "শিক্ষা পুনর্গঠন কমিশন" নামে ৩রা জানুয়ারি, ১৯৫৭ সালে একটি কমিশন গঠন করে।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ও তৎপরবর্তী উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা

পাকিস্থানী শাসকগোষ্ঠী ১৯৫২ সালে রাষ্ট্র ভাষা উর্দু বাধ্যতামূলকভাবে এদেশে চালু করার জন্য সার্বিকভাবে প্রচেষ্টা চালান তখন এদেশের সচেতন আবালবৃদ্ধবনিতা রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চালু করার জীবন পণ সংগ্রাম শুরু করে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সালাম, বরকত, জব্বার, রফিক তাঁদের বুকের তাজা রক্ত দিয়ে ঢাকার রাজপথ রক্তে রঞ্জিত করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা রূপে প্রতিষ্ঠার স্থায়ী ভিতভূমি রচনা করে দিয়ে যান। এরপর থেকে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী এদেশের উচ্চ শিক্ষাসহ সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে পঙ্গু করার জন্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম কুটনৈতিক কৌশলে নানা পন্থায় নস্যাৎ করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে।

এদিকে দেশ বিভাগের পর স্বনামখ্যাত বহু হিন্দু শিক্ষক দেশ ছেড়ে ভারতে চলে যাওয়ায় দীর্ঘদিন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শূন্যতা বিদ্যমান থাকে। এছাড়া ইংরেজ শাসনে কেরাণী তৈরির শিক্ষাক্রম ও

পাঠ্যসূচিতে যে সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল তা সংস্কার প্রক্রিয়া নানা অজুহাতে বিলম্ব করতে শুরু করে।

অপরদিকে এদেশের সচেতন ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি অন্যদিকে প্রলুব্ধ করার জন্য এদেশের উচ্চ শিক্ষার জন্য ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় স্বল্প সময়ে স্থাপনের পরিকল্পনা বেশ ফলাও করে সফল প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে অবহিত করার জোরালো ব্যবস্থা করে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যদিও এদেশে স্থাপিত হয় কিন্তু সময় লেগে যায় প্রায় ১৮ বছর। এখানে এসব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কালানুক্রমিক ফিরিস্তি দেওয়া হল:

১৯৪৭-৭১ সালের মাধ্যে ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়, যথা: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫৩), বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬১), বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬২), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৬৫) এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭০)।

শরীফ শিক্ষা কমিশন গঠনের পটভূমি

পাকিস্তান হওয়ার পর প্রশাসনের প্রয়োজনে শিক্ষিত যুবকদের চাহিদা ছিল অনেক। এই চাহিদার কথা মনে রেখে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি না করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর ফলে একদিকে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে অন্যদিকে শিক্ষা ব্যবস্থায় অব্যবস্থা প্রাধান্য পেতে থাকে। যোগ্য শিক্ষকের অভাব ছিল প্রকট এবং অযোগ্য শিক্ষক নেওয়ার সামাজিক চাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে শিক্ষা ব্যবস্থায় অশুভ দিকগুলোর দ্রুত বৃদ্ধি লক্ষ করা যায়। নোট বই, মুখস্থ শক্তি ও প্রাইভেট টিউশনি নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা ধীরে ধীরে সমস্ত সমাজে ক্ষত সৃষ্টি শুরু করে। নোট বই এবং প্রাইভেট টিউশনি অর্থকরী প্রতিষ্ঠান/পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। কয়েক বৎসর পরই শিক্ষিত যুবকের চাহিদা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পায়। শিক্ষার সামগ্রিক পরিবর্তন অনুভূত হয়, যার ফলে ১৯৫৮ সালে শরীফ শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। শরীফ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৯ সালে। শরীফ কমিশনের রিপোর্টের পর অনেক বিতর্ক শুরু হয়েছিল। শরীফ কমিশনে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি নুতন প্রস্তাব রেখেছিল- যা ভবিষ্যতে দিক নির্দেশনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। শিক্ষার কাঠামোর প্রশ্নে একটি প্রস্তাব ছিল: পাশ ও অনার্স উভয়ক্ষেত্রে ৩ বৎসর মেয়াদী কোর্স এবং মাস্টার্স হবে ২ বৎসর মেয়াদী। কাঠামোর প্রশ্নে এখনো কোন সুরাহা হয়নি।

শরীফ কমিশনে উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধীয় উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ

পাকিস্তানের জাতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৫৯) যা শরীফ শিক্ষা কমিশন নামে বহুল পরিচিত। এই শিক্ষা কমিশন সমগ্র পাকিস্তানের উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কে বিশদ সুপারিশমালা প্রণয়ন করে। নিম্নে তার উল্লেখযোগ্য প্রধান প্রধান সুপারিশ সংক্ষেপে উপস্থাপিত হল:

ডিগ্রী কোর্স

(ক) আর্টস ও বিজ্ঞানে ব্যাচেলর ডিগ্রীর জন্য দুই বৎসরের কোর্সগুলো সম্প্রসারিত করে তিন বৎসর করা উচিৎ।

(খ) মাস্টার ডিগ্রী কোর্সের মেয়াদ দুই বছর হওয়া উচিৎ।

শিক্ষার বিষয়বস্তু

(ক) প্রচলিত বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার বিষয়বস্তু সংশোধন করা উচিৎ।

(খ) সমাজ ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের বিষয় বর্তমান বাস্তব সমস্যাভিত্তিক হওয়ার জন্য জোর দেওয়া উচিৎ।

(গ) সমাজ বিজ্ঞান, গার্হস্থ অর্থনীতি, প্রশাসন ও ব্যবসা পরিচালনা, সাংবাদিকতা ইত্যাদি সাম্প্রতিক বিষয়গুলোর উপর জোর দেওয়া উচিৎ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও তাঁর কর্তব্য

(ক) বক্তৃতাদান, গবেষণা, হাতে-কলমে প্রদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষাদান, টিউটোরিয়াল ইত্যাদি।
(খ) গবেষণা
(গ) ব্যক্তিগত অধ্যয়ন ও শ্রেণি পাঠদানের জন্য সর্বদা প্রস্তুতি গ্রহণ।
(ঘ) শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষার্থীদেরকে পরামর্শ দানের মাধ্যমে উৎসাহ দান।

শিক্ষা ও পরিচালনা ব্যবস্থা সহজ করার জন্য এই আইনগুলো সংশোধন করা দরকার

(ক) 'একাডেমিক কাউন্সিল' ও 'বোর্ডস অব স্টাডিজ' এর উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।
(খ) 'নির্বাচিত' ব্যক্তিদের সংখ্যা হ্রাস করা উচিত।
(গ) পরিচালনা করা কঠিন এরূপ বৃহদায়তন সংস্থাগুলো বিলোপ করা উচিত।
(ঘ) চ্যান্সেলর এবং ভাইস-চ্যান্সেলরের ক্ষমতা যথাযথভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া উচিত।
(ঙ) চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে ক্ষুদ্রাকার সিন্ডিকেট গঠিত হওয়া উচিত এবং এর মধ্যে কিছু সংখ্যক শিক্ষক প্রতিনিধি থাকা উচিত।
(চ) কয়েকটি বিশেষ কমিটি গঠন করে এদের উপর (১) পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, (২) শিক্ষক নির্বাচন এবং (৩) শিক্ষকদের কাজের মূল্য নিরূপণের ভার দেওয়া উচিত।
(ছ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এবং পরিচালন বিভাগসমূহ পৃথক করা এবং এই দুই বিভাগের কর্তৃত্ব দুইজন পৃথক অফিসারের উপর ন্যস্ত করা উচিত। তাঁরা সরাসরি ভাইস-চ্যান্সেলরের অধীনে কাজ করবেন।

শিক্ষার্থীর শারীরিক মানসিক ও অধ্যয়ন পরিবেশ তৈরির সুযোগ সৃষ্টি করা উচিৎ

(ক) খেলার মাঠের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা।
(খ) নাটক, বিতর্ক, সঙ্গীত এবং গৃহাভ্যন্তরীণ খেলাধূলার সুসংহত কর্মসূচি।
(গ) শিক্ষক এবং ছাত্রদের মধ্যে ঘরোয়া আলাপ-আলোচনার জন্য ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র স্থাপন।
(ঘ) বিরতির সময় এবং ছুটির পরে অধ্যয়নের জন্য পাঠাগারে পর্যাপ্ত স্থান সংকুলানের ব্যবস্থা।
(ঙ) স্বাস্থ্যকর পরিবেশে স্বল্পমূল্যে খাবার গ্রহণ করিবার জন্য 'কাফেটেরিয়া'।

উচ্চতর শিক্ষায় পরীক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন বিভাগ কোন বিষয়ে মৌলিক ও ফলিত এবং একশন রিচার্স করবে তা "কমিটি ফর এ্যাডভান্স স্টাডিজ" নির্ধারণ করবে। এছাড়া কোন বিভাগ পি.এইচডি সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত ও নির্ধারণ করবে; বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকবৃন্দের আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রসারিতকরণ; পদোন্নতি দান; উচ্চ শিক্ষার সুযোগ, গ্রন্থাগার এবং সর্বোপরি বিশ্ববিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে সেবার মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপন এসব বিশদ সুপারিশ মালা প্রদান করে।

১৯৬১-৬২ ছাত্র আন্দোলন ও পরবর্তীতে উচ্চ শিক্ষা

কুখ্যাত হামিদুর রহমান শিক্ষা রিপোর্ট প্রবর্তনের বিরুদ্ধে এদেশের সচেতন ছাত্র সমাজ রুখে দাঁড়ায়। পরিণামে সরকারকে তা তুলে নিতে হয়। হামিদুর রহমানের শিক্ষা সম্বন্ধীয় রিপোর্টের মাধ্যমে এদেশের উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কে পাকিস্তানী শাসকদের বৈমাতৃসুলভ ব্যবহারের বহিঃ প্রকাশ ঘটে। এদিকে যতই দিন যেতে থাকে এদেশের উচ্চ শিক্ষার প্রতি তাদের বৈরিতা ততই চরমের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। অপরদিকে এদেশের ছাত্র-শিক্ষক-জনতার সচেতনতা ও ঐক্যের বন্ধন মজবুত/সুদৃঢ় হয়ে পরিণামে ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের রূপ লাভ করে এবং পরিণামে স্বাধীনতা আন্দোলনে পরিগণিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.২

অ) বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. দেশ বিভাগের পর এদেশের উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার বর্ণনা করুন।

২. ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন উত্তর উচ্চ শিক্ষার জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল?

৩. শরীফ শিক্ষা কমিশন গঠনের পটভূমির বর্ণনা দিন।

৪. শরীফ শিক্ষা কমিশনের উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান সুপারিশ বিবৃত করুন।

পাঠ ৬.৩ বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- কমিশনের বিভিন্ন বিভাগগুলো পৃথক পৃথকভাবে বিবৃত করতে পারবেন;
- বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- কমিশনের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাজ বর্ণনা করতে পারবেন।

কমিশন প্রতিষ্ঠা

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় জ্ঞান বিকাশের স্বাধীনতা এবং উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণায় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের স্বায়ত্তশাসন বজায় রেখে সরকারের ভূমিকা প্রতিপালনে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রতিনিধি নিয়েই একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম চেয়ারম্যান হিসেবে স্বনামখ্যাত শিক্ষাবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রয়াত প্রফেসর মোজাফ্ফর আহমদ চৌধুরী ১৫ এপ্রিল ১৯৭৩ সালে কমিশনে যোগদান করেন। প্রায় একই সঙ্গে ১৯ এপ্রিল ১৯৭৩ সালে প্রফেসর এম ইন্নাস আলী এবং ২৮ এপ্রিল ১৯৭৩ সালে প্রয়াত প্রফেসর মুহম্মদ এনামুল হক প্রথম পূর্ণকালীন সদস্য হিসেবে কমিশনে যোগদান করেন।

কমিশনের গঠন

১৯৭৩ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতির ১০ নম্বর আদেশক্রমে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর অস্তিত্ব সংবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কমিশনের চেয়ারম্যান এবং পূর্ণকালীন সদস্যদ্বয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে থাকেন। উক্ত আদেশের ৪ নম্বর অনুচ্ছেদ মোতাবেক কমিশনের গঠন হচ্ছে: চেয়ারম্যান ১ জন, পূর্ণকালীন সদস্য ২ জন, খণ্ডকালীন সদস্য ৯ জন। তন্মধ্যে দুই বছর অন্তর পর্যায়ক্রমে ৩ জন উপাচার্য ও ৩ জন ডীন অথবা প্রফেসর এবং সরকার কর্তৃক মনোনীত ৩ জন যেমন- শিক্ষা সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি এবং পরিকল্পনা কমিশনের একজন সদস্য।

কমিশনের কার্যাবলি

১৯৭৩ সালের রাষ্ট্রপতির ১০ নম্বর আদেশ এর ৬ নম্বর অনুচ্ছেদ মোতাবেক কমিশনের দায়িত্ব সংক্ষেপে নিম্নরূপে নির্ধারণ করা হয়েছে:

১. বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার চাহিদা নিরূপণ এবং উচ্চ শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;

২. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আর্থিক চাহিদা নির্ধারণ করা;

৩. সরকারের নিকট থেকে তহবিল গ্রহণ করা এবং বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন খাতে চাহিদা ও সার্বিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে অনুদান বরাদ্দ করা;

৪. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিভাগ, ইনস্টিটিউট ও অন্যান্য অঙ্গীভূত প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম মূল্যায়ন করা;

৫. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সকল প্রকার উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা পরীক্ষার পর সুপারিশ পেশ করা;

৬. বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাবলী সংগ্রহ করা;

৭. নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সম্প্রসারণ বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দান করা;

৮. সরকার কিংবা কোন আইন বলে প্রদত্ত যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগ বা দায়িত্ব পালন করা।

কমিশনের বিভাগ পরিচিতি

কমিশনের চেয়ারম্যানের দপ্তর, পূর্ণকালীন সদস্যদ্বয়ের দপ্তর ছাড়াও কমিশনের কার্যক্রম মূল চারটি বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। বিভাগগুলো হচ্ছে: (ক) প্রশাসন বিভাগ, (খ) পকিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ, (গ) অর্থ ও হিসাব বিভাগ, (ঘ) গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ। এ ছাড়াও কমিশনের নিজস্ব পরিচালনাধীন ইনস্টিটিউট অব সাইন্টিফিক ইন্সট্রুমেন্টেশন নামে একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান আছে। সরকারের রাজস্ব বাজেট থেকে কমিশনের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রশাসনিক ও গবেষণা খাতে কমিশন অনুদান পেয়ে থাকে।

প্রশাসন বিভাগ

কমিশনের প্রশাসন বিভাগ কমিশনের সচিবের নিয়ন্ত্রণাধীনে কমিশনের সভা, উপাচার্যবৃন্দের সভা, বিধি-বিধান, নিয়োগ, পদোন্নতি, ডিগ্রী সমতা বিধান, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন সংক্রান্ত কার্যাবলি, জাতীয় অধ্যাপকবৃন্দের সম্মানী প্রদান, ইউজিসি পিএইচডি ফেলোশীপ, কমনওয়েল্থ স্কলারশীপ ও ফেলোশীপ, ইউনেস্কো ও সার্ক ফেলোশীপসহ যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, কারিগরি সাহায্য পরিকল্পনা এবং সরকারি নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সার্বিক উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের বিষয়ে সরকারি কোষাগার থেকে অর্থ ছাড় করে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা এই বিভাগের মুখ্য দায়িত্ব। উন্নয়নমূলক কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন হচ্ছে কি না সে সম্পর্কে সরেজমিনে পরীক্ষা, সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ থেকে প্রতিবেদন সংগ্রহ, অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং এই বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও পরমার্শ প্রদান করা এই বিভাগের অন্যতম দায়িত্ব। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রজেক্ট কনসেপ্ট পেপার এই বিভাগ থেকেই প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উন্নয়নমূলক বাজেটের শতকরা ১০০ ভাগ অর্থ সরকারি তহবিল থেকে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এই বিভাগের পরিচালনায় রয়েছেন একজন পরিচালক।

অর্থ ও হিসাব বিভাগ

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রতি বছরের পৌনঃপুনিক বাজেট প্রস্তাব সরেজমিনে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের বিষয়ে শিক্ষা ও অর্থ মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ পেশ এবং যথাসময়ে সরকারি তহবিল হতে অর্থ ছাড় করিয়ে পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে যথাযথভাবে বণ্টন করা এই বিভাগের মুখ্য কাজ। উল্লেখ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পৌনঃপুনিক বাজেটের শতকরা ৯০ ভাগ অর্থ সরকারি তহবিল থেকে পাওয়া যায়। এছাড়া এই বিভাগ থেকে কমিশনের আর্থিক ব্যবস্থাপনাও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এই বিভাগের একাউন্টস, বাজেট এবং অডিট নামে তিনটি শাখা আছে। এই বিভাগ একজন পরিচালক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ

কমিশনের গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের একাডেমিক কার্যক্রম বিশেষতঃ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গবেষণার ভিত্তি দৃঢ় ও সংহত করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়। কমিশনের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে একটি পৃথক সরকারি অনুদানের মাধ্যমে এই বিভাগের অর্থায়ন হয়ে আসছে। মূলত: এই বিভাগ কলা ও মানবিক, সামাজিক বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও কারিগরি, এই তিনটি শাখায় দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকদের গবেষণা কার্যক্রমে বার্ষিক গবেষণা প্রকল্প প্রদানের মাধ্যমে

নিয়োজিত রাখে। একে একাডেমিক স্টাফ ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ প্রজেক্ট বলা হয়। আগে একে সিনিয়র রিসার্চ ফেলোশীপ বলা হতো এবং জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশীপের আওতায় পি.এইচডি করানো হত। বর্তমানে এই শাখায় গবেষণা সহায়ক তহবিল ও শিক্ষা সহায়ক তহবিলের মাধ্যমে গবেষণার কাজে সহায়তা দানের লক্ষ্যে গবেষণার উপাত্ত সংগ্রহ, যন্ত্রাংশ খরিদ, বিদেশে প্রকাশিত পুস্প্রাপ্য গ্রন্থ বা গবেষণাপত্রের মাইক্রো ফ্লিম/ফটোকপি সংগ্রহ ইত্যাদির জন্য অনুদান দেয়া হয়ে থাকে। এই বিভাগের অন্তর্গত প্রকাশনা ও তথ্য কোষ শাখা থেকে মঞ্জুরী কমিশন এবং এর ১২ ধারা মতে জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। এছাড়াও গবেষণা প্রতিবেদন ও উচ্চস্তরের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের কাজও এই শাখা থেকে করা হয়ে থাকে। এই বিভাগের অন্তর্গত একটি রেফারেন্স লাইব্রেরীও আছে। গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের আওতায় এ যাবত ৮০৬টি গবেষণা প্রকল্পে অনুদান দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে ৪৬৬টি প্রকল্পের সমাপ্তি রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে। বার্ষিক প্রতিবেদনসহ মঞ্জুরী কমিশনের প্রকাশন সংখ্যা ৬০টি। বর্তমানে এই বিভাগ একজন পরিচালক কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে।

ইনস্টিটিউট অব সাইন্টিফিক ইন্সট্রুমেন্টেশন

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গবেষণাগারে ব্যবহৃত মূল্যবান বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিসমূহ যথাযথ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ল্যাবরেটরি কর্মীদের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে ১৯৭৫ সালে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক ইনস্টিটিউট অব সাইন্টিফিক ইন্সট্রুমেন্টেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই ইনস্টিটিউটটি পৃথক নির্বাহী বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত কমিশনের একটি অঙ্গ সংগঠন। এই ইনস্টিটিউট একজন পরিচালক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আদেশের ৫(১)(জি) ধারা মতে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন অথবা বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সম্প্রসারণের ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দান করা কমিশনের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনের অনুসঙ্গে নিম্নলিখিত ইনস্টিটিউটসমূহ মঞ্জুরী কমিশনের উদ্যোগে স্থাপিত হয়।

(ক) আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

(খ) পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

(গ) ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

(ঘ) গ্রাজুয়েট ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

(ঙ) ইনস্টিটিউট অব কম্পিউটার সায়েন্স, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।

(চ) ইনস্টিটিউট অব ফ্লাড কন্ট্রোল এণ্ড ড্রেনেজ রিসার্চ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।

(ছ) ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্স, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

(জ) ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট্রি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলাদেশ মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সুবিধা দেশের সকল অংশের জনগণের নিকট সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে কমিশন ১৯৮৩ সালে খুলনা বিভাগে একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সরকারের নিকট প্রস্তাব পেশ করে। ১৯৮৫ সালের ৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত কমিশনের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক রূপরেখা সম্বলিত সুপারিশ

পেশের জন্য অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর নেতৃত্বে কমিশন কর্তৃক ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৮৫ সাল থেকে ১৯৯২ সালের মধ্যে দেশে প্রায় স্বাধীনতা পূর্বকালের সমান সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। ১৯৯২ সালের ৩৭ ও ৩৮ নম্বর অধ্যাদেশ বলে যথাক্রমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। উচ্চ শিক্ষা খাতে বরাদ্দের অপ্রতুলতার জন্য মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশ মোতাবেক "বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ১৯৯২" সরকার কর্তৃক জারী হওয়ার পর দেশে বর্তমানে ১৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

উচ্চ শিক্ষার গুণগত মান সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নির্মাণ ও অন্যান্য অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধাসহ একাডেমিক উন্নয়নের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় ত্রিবার্ষিক পরিকল্পনায় "বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প ১৯৯৫-৯৮" গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমান সরকার পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জাতীয় শিক্ষানীতির ভিত্তিতে উচ্চ শিক্ষার উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে দেশের ১২টি পুরাতন জেলা সদরে একটি করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা দিয়েছেন। এজন্য প্রকল্প প্রণয়নের কাজ শুরু হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৩

অ) বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রতিষ্ঠা এবং কমিশন গঠনের বর্ণনা দিন।

২. বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কার্যাবলির প্রধান দিকগুলো বিবৃত করুন।

৩. বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নতুন ইনস্টিটিউটসমূহের নাম উল্লেখপূর্বক অন্যান্য কার্যাবলি বিবৃত করুন।